পৃথিবী বদলে দেওয়া ১০ পরীক্ষণ

রীক্ষণের ইতিহাস বেশ পুরোনো। হাজার বছর ধরে মানুষের হাত ধরে পরীক্ষণের ফলে বিজ্ঞানের নিয়মনীতি ও ঘটনা আবিষ্কৃত হয়ে চলছে। কখনো পরীক্ষণ ব্যর্থ হয়েছে, কখনো অভাবনীয় সাফল্য পাওয়া গেছে। কিছু সাফল্য ও ব্যর্থতা আগের ধারণা পুরোপুরি বদলে দিয়েছে। নতুন পথ দেখিয়েছে। এখানে সব বদলে দেওয়া ১০টি এক্সপেরিমেন্টের কথা

বলা হলো।

১. আকার মাপেন এরাটোস্থেনিস

খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে এরাটোস্থেনিস আলেক্সান্দ্রিয়া লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক ছিলেন। একটা বই পেলেন সেখানে। তাতে লেখা, বছরের বিশেষ এক দিনে মিসরের সাইনিতে বস্তুর ছায়া পড়ে না। প্রতিবছর ২১ জুন ঘটনাটা ঘটে, ঠিক মধ্যদুপুরে। কারণ, ওই সময় সূর্য মাথার ওপরে থাকে। সাইনি আলেক্সান্দ্রিয়ার দক্ষিণের এক শহর। এরাটোস্থেনিস সমান দৈর্ঘ্যের লাঠি ব্যবহার করেন। একই দিনে একই সময়ে দুই শহরে লাঠির ছায়ার দৈর্ঘ্য মাপেন এরাটোস্থেনিস। ছায়ার দৈর্ঘ্যের পার্থক্যব্যবহার করে পৃথিবীর পরিধি মাপতে সক্ষম হন তিনি। ছায়া দুটির কৌণিক ব্যবধানও মাপেন তিনি। সেখান থেকে আলেক্সান্দ্রিয়া আর সাইনির মধ্যে কৌণিক ব্যবধান বের করেন প্রথমে। ব্যাপারটা এমন, আলেক্সান্দ্রিয়া থেকে সাইনি পর্যন্ত একটা বৃত্তচাপ আঁকলে পাওয়া যায় ৭ দশমিক ২ ডিগ্রি। আমরা জানি, বৃত্তের মোট কৌণিক দৈর্ঘ্য ৩৬০ ডিগ্রি। ৭ দশমিক ২ ডিগ্রি আসলে ৩৬০ ডিগ্রির ৫০ ভাগের এক ভাগ। পৃথিবীকে গোলাকার ধরে নিলে তার কৌণিক দৈর্ঘ্যও ৩৬০ ডিগ্রি। তাই আলেক্সান্দ্রিয়া ও সাইনির রৈখিক দূরত্বও পৃথিবীর পরিধির ৫০ ভাগের ১ ভাগ হবে। আলেক্সান্দ্রিয়া থেকে সাইনির দূরত্ব তখন স্ট্যাডিয়ন এককে মাপা হয়েছিল। কিলোমিটারে রূপান্তর করলে পাওয়া যায় ৮০০ কিলোমিটার। এটাকে যদি ৫০ দিয়ে গুণ করা হয়, তাহলেই পুরো পৃথিবীর পরিধি পাওয়া যাবে। এরাটোস্থেনিস পৃথিবীর পরিধি পেয়েছিলেন ৪০ হাজার কিলোমিটার। তিনি প্রথম প্রায়সঠিকভাবে পৃথিবীর পরিধি মাপেন।

২. উইলিয়ান হার্ভের রক্ত পরিবহনতন্ত্র

দ্বিতীয় শতাব্দীর গ্রিক শরীরবিদ ও দার্শনিক গ্যালেন রক্ত পরিবহনপ্রক্রিয়া নিয়ে ভুল ধারণা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, খাবার ব্যবহার করে লিভার সব সময় নতুন রক্ত তৈরি করতে থাকে। সেই রক্ত দুটি আলাদা স্রোতে প্রবাহিত হয়। এর একটি স্রোত কোনো এক আধ্যাত্মিক উপায়ে বাতাস থেকে ফুসফুসের মাধ্যমে আমাদের দেহে ঢোকে। এই রক্ত টিস্যুতে যাওয়ার পর সেখান থেকে তা আর হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে না। পুরো রক্ত টিস্যু শুষে নেয়। ১৫০০ বছর ধরে মানুষ এই ভুল ধারণা নিয়ে ছিল। ১৬২৮ সালে উইলিয়াম হার্ভে প্রকাশ্যে জীবজন্তুর শরীরের ব্যবচ্ছেদ করে মানুষকে রক্ত পরিবহনতন্ত্র দেখান। জীবিত প্রাণী ব্যবচ্ছেদ করে তিনি দেখান, রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে ফুসফুসে যায় এবং পরে ফুসফুস থেকে হৃৎপিণ্ডে ফিরে এসে তা আবার সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে।

গ্যালেন একটা সাপের মূল ধমনিতে আঙুলের সাহায্যে রক্ত পাম্প করে দেখান, রক্ত ধমনি, উপধমনি, শিরা, উপশিরার মাধ্যমে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। পুরো প্রক্রিয়া দেখিয়ে তিনি একটা বই লেখেন। নাম দ্য মোশন অব হার্ট। এখন পর্যন্ত তিনি আধুনিক শারীরবিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যার জনক হিসেবে স্বীকৃতি পান।

৩. গ্রেগর মেন্ডেল জেনেটিকস

এক শিশু জন্মালে তার মধ্যে মা–বাবার কতটুকু বৈশিষ্ট্য থাকবে? সে কি দেখতে মা–বাবার মতো হবে? এই প্রশ্নের উত্তর দেড় শ বছর আগে বের হওয়া শুরু করে। বর্তমানের চেক রিপাবলিকে ১৮২২ সালে জন্ম নেন গ্রেগর মেন্ডেল। যাঁর হাত ধরে শুরু হয় আধুনিক জেনেটিকস। ১৮৪৩ সালে তিনি এক গবেষক দলে যোগ দেন। এরপর বাগানে গাছ ও ফসলের মধ্যে পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করে সময় কাটানো শুরু করেন। বিভিন্ন জাতের মধ্যে ক্রস করে নতুন ধরন ও রঙের প্রজাতি বের করার চেষ্টা করেন। বারবার একই রকম ফল পাচ্ছিলেন। তাই তিনি প্যাটার্ন বের করার চেষ্টা করেন।মটরশুঁটিগাছ নিয়ে পরীক্ষায় তাঁর চেষ্টা সফল হয়। সাত বছর ধরে হাজার হাজার মটরশুঁটি পরীক্ষা করেন। তিনি দেখেন, কিছু মটরশুঁটি হলুদ আর কিছু সবুজ, আবার কিছু মসৃণ আর কিছু কুঁচকানো, কোনোটির কান্ড বড়, কোনোটির লম্বা। এমন বৈশিষ্ট্যগুলোর পার্থক্য ধরা অনেকটা সহজ। তিনি আবিষ্কার করেন, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে মটরশুঁটি যত অগ্রসর হয়, তত আগের হারিয়ে যাওয়া বৈশিষ্ট্য একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে ফিরে আসে।

৪. নিউটনের আলোর বিচ্ছুরণ

নিউটন প্লেগ মহামারি থেকে বাঁচতে কেমব্রিজ ছেড়ে যে গ্রামে শৈশব কাটিয়েছেন, সেখানে ফিরে গিয়েছিলেন। ওই সময়ে নিউটন বিখ্যাত হননি। সে সময় তিনি এক মেলা থেকে কয়েকটা খেলনা প্রিজম কেনেন। সেগুলো দিয়ে এ সময় আলোর বিচ্ছুরণ পর্যবেক্ষণ করেন। সেই সময়ে ভাবা হপ্রিজম থেকে যে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটে বা সাত রঙের রংধনু দেখা যায়, সেটা প্রিজমের মধ্যকার উপাদানের কোনো ব্যাপার।

নিউটন তাঁর ঘরের জানালায় একটা সূক্ষ্ম ছিদ্র করেন। একটা আলোকরশ্মি সেখান থেকে প্রবেশ করে। দুটি প্রিজম পাশাপাশি রেখে তিনি রশ্মিটি প্রিজমে প্রবেশ করান। প্রথম প্রিজম থেকে সূর্যরশ্মি বের হয়ে সাত রঙে বিশ্লিষ্ট হয়। এটাই ছিল আলোর বিচ্ছুরণের প্রথম পরীক্ষা। ১৬৭২ সালে নিউটন আলোর বিচ্ছুরণ নিয়ে পেপার লেখেন, যা নিউটনকে বিখ্যাত করে তোলে।

৫. মাইকেলসন-মরলির পরীক্ষা

শব্দতরঙ্গ চলার বাতাসে ঢেউ তুলে এগিয়ে যায়। কিন্তু আলোর তরঙ্গ কীভাবে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায়? বিজ্ঞানীরা দেখেন, কোনো মাধ্যম ছাড়াই আলো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায়। উনিশ শতকের বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, আলো ইথার নামে একধরনের মাধ্যমে ঢেউ তুলে সামনে এগিয়ে চলে। মহাবিশ্বের সবখানে এই ইথার ছড়িয়ে আছে। গবেষকদের ধারণা ছিল, পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে। পৃথিবীর সঙ্গে ঘোরে ইথারও। ফলে ইথারের ঝড় ওঠে পৃথিবীকে ঘিরে। তাই আলোকরশ্মি ইথার প্রবাহের অভিমুখে গেলে দ্রুত যাবে, ইথার প্রবাহের বিপরীতে গেলে কমে যাবে আলোর গতি। আসলেই এই তত্ত্ব ঠিক কি না, সেটা দেখার জন্য মার্কিন বিজ্ঞানী আলবার্ট মাইকেলসন ও এডওয়ার্ড মরলি একটি পরীক্ষা করেন। এ জন্য তাঁরা তৈরি করেন একটা ইন্টারফেরোমিটার। ইন্টারফেরোমিটারে দুটি আয়নাকে পরস্পর লম্বভাবে বেশ কিছুটা দূরে স্থাপকরা হয়। ব্যবহার করা হয় টর্চলাইটের মতো একটা আলোক উৎস। আলোক উৎস থেকে বেরিয়ে আলোকরশ্মির চলার পথে একটা আয়না রাখা হয়, আলোকরশ্মির সঙ্গে ৪৫ ডিগ্রি কোণ করে আরেকটা আয়না রাখা হয়। আয়নাটির পেছনে সিলভারের অর্ধস্বচ্ছ প্রলেপ দেওয়া। অর্থাৎ এর ওপর যে আলোর আলোকরশ্মি পড়ে, তার অর্ধেক বেরিয়ে যায় অর্ধস্বচ্ছ প্রলেপ ভেদ করে। বেরিয়ে যাওয়া সেই আলো গিয়ে পড়ে প্রথম আয়নায়। বাকি অর্ধেক আলো অর্ধস্বচ্ছ আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে লম্বভাবে রাখা আয়নায় গিয়ে পড়ে। দুই আয়না থেকে প্রতিফলিত হয়ে আসা আলো

একটা আলোক ডিটেক্টরে এসে পড়ে। দুই আয়না থেকেই ডিটেক্টরের দূরত্ব সমান। যদি ইথার নামের কোনো মাধ্যম থাকত, তাহলে দুই আয়না থেকে প্রতিফলিত আলো একই সময়ে ডিটেক্টরে পৌঁছাতে পারত না। কিন্তু মাইকেলসন-মরলির পরীক্ষায় দেখা গেল, একই সময়ে দুই রশ্মি এসে পৌঁছায় না। এই পরীক্ষাথেকেই প্রমাণিত হয়, ইথার বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব মহাবিশ্বে নেই। এই পরীক্ষার মাধ্যমে অনেকটাই নিশ্চিত হওয়া গিয়েছিল আলোর বেগ আসলে ধ্রুব রাশি। পরে এই সিদ্ধান্তই আইনস্টাইনের বিখ্যাত থিওরি অব রিলেটিভিটির পথ সুগম করে দিয়েছিল।

৬. কুরি দম্পতি ও তেজস্ক্রিয়তা

১৮৬৭ সালে মেরি কুরি পোল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। ২৪ বছর বয়সে প্যারিসে যান গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা নেওয়ার ইচ্ছায়। এ সময় তাঁর পরিচয় হয় ফরাসি বিজ্ঞানী পিয়েরে কুরির সঙ্গে। যিনি ইতিমধ্যে চৌম্বকত্ব ও পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মৌলিক গবেষণা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। একসময় তাঁরা বিয়ে করেন। মেরি কুরি পিয়েরে কুরির সঙ্গে যৌথভাবে গবেষণা করেন। ১৮৯৮ সালে এই দম্পতি প্রথমে পিচব্লেন্ড থেকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ পোলোনিয়াম এবং পরে রেডিয়াম আবিষ্কার করেন। ১৮৮৭ সালে মেরি তাঁর ডক্টরাল থিসিসের জন্য নতুন ধরনের তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিয়ে গবেষণা করছিলেন। যেটা এক বছর আগে আবিষ্কৃত হয়েছে। তিনি ইলেকট্রোমিটার নামক যন্ত্র ব্যবহার করে থোরিয়াম ও ইউরেনিয়াম থেকে বের হওয়া তেজস্ক্রিয়তা মাপেন। যন্ত্রটি তৈরি করেন পিয়েরে কুরি ও তাঁর ভাই। বিরল ধাতু ইউরেনিয়ামের লবণ থেকে তাঁরা রেডিয়াম, পোলোনিয়াম মৌল দুটি আবিষ্কার করেন। এ ছাড়া কুরি দম্পতি প্রমাণ করেন, কোন কোন মৌলের পরমাণু ক্রমাগত ভেঙে গিয়ে রশ্মি বিকিরণ করে। এই বিকিরণ অন্য পদার্থ ভেদ করে যেতে পারে। এ ধরনের পদার্থকে বলে তেজস্ক্রিয় পদার্থ। এর স্বতঃস্ফূর্ত বিকিরণের গুণকে বলে তেজস্ক্রিয়তা। এ আবিষ্কারের জন্য ১৯০৩ সালে মেরি কুরি এবং পিয়েরে কুরি যৌথভাবে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯১০ সালে মেরি কুরি রেডিয়াম ক্লোরাইডকে তড়িৎ বিশ্লেষণ করে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ রেডিয়াম নিষ্কাশন করেন। এই অসাধারণ উদ্ভাবনের জন্য ১৯১১ সালে মেরিকে রসায়নে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে তিনিই একমাত্র নারী, যিনি দুবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

৭. ইভান পাভলভের পাচক রস পরীক্ষা

রাশিয়ান শরীরতত্ত্ববিদ ইভান পাভলভ ১৯০৪ সালে নোবেল পুরস্কার পান। তিনি অনুসন্ধান করেন কীভাবে কুকুরের মুখের স্যালাইভা ও পাকস্থলীর রস খাবার হজম করতে সাহায্য করে? পরীক্ষাটা কুকুরের সাহায্যে করা হলেও মানুষ ও অন্যান্য জীবের ক্ষেত্রেও তাঁর গবেষণা সুফল নিয়ে এসেছে। কুকুরের লালা ও গ্যাস্ট্রিক জুস খুব সহজে সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না পাভলভের জন্য। তিনি কুকুরের গালে বিশেষ পদ্ধতিতে ছিদ্র করে রাবারযুক্ত কাচের নল লালাগ্রন্থির সঙ্গে লাগিয়ে দেন। যে কুকুরগুলো নলের সঙ্গে পরিচিত, তারা খাবার আসার আগেই নলে লালা ছেড়ে দিত। সে সময় শরীরের অন্যান্য স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়ার মতো লালা ক্ষরণকেও রিফ্লেক্স হিসেবে ধরা হতো। ভাবা হতো এটা খাবার পেলে নিজে নিজে কাজ করে এবং অপরিবর্তনীয়। কিন্তু পাভলভ দেখান, কুকুরগুলোর লালা ক্ষরণ অন্য উপকরণের ওপর নির্ভর করে। কুকুরদের অভিজ্ঞতা খাবারে মুখ দেওয়ার আগেই লালা ক্ষরণে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। পাভলভের দল নির্দিষ্ট সময় পরপর একই মাত্রায় শব্দকরে, হুইসেল বাজিয়ে, আলো জ্বেলে, বস্তুর অবস্থান ঘুরিয়ে বা ইলেকট্রিক শক দিয়ে এই পরীক্ষণ চালিয়েছে। তিনি কখনো বেল বাজাননি। পাভলভের কাজ স্বাভাবিক উদ্দীপনা ও প্রতিক্রিয়া নিয়ে ক্ল্যাসিক্যাল ও পাভলভিয়ান শর্তের ভিত্তি তৈরি করেছে। বর্তমানে আসক্তি, ট্রমাজনিত আঘাতের ক্ষেত্রে পাভলভেরআঘাতের ক্ষেত্রে পাভলভের গবেষণা কাজে.

৮. রবার্ট মিলিক্যানের অয়েল ড্রপ পরীক্ষা

বিংশ শতাব্দী পদার্থবিজ্ঞানের জন্য এক উজ্জ্বল শতক। প্রথম দশকেই কোয়ান্টাম ফিজিকস, স্পেশাল রিলেটিভিটি ও ইলেকট্রন সম্পর্কে জানা যায়। তখন জে জে টমসন ইলেকট্রন আবিষ্কার করেছেন সদ্য। তখন ইলেকট্রন মিলিক্যানের জন্য সুযোগ নিয়ে আসে। গবেষকেরা ইলেকট্রনের চার্জ নিয়ে সংশয়ে ছিলেন। ইলেকট্রনের চার্জ আসলে কতটুকু, সেটা নিয়ে ধোঁয়াশা, মিলিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ল্যাবে এটি নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেন। তিনি কনটেইনারে পুরু পানির বাষ্প নিয়ে কাজ শুরু করেন। যেটাকে মেঘ প্রকোষ্ঠ বা ক্লাউড চেম্বার বলে। যেখানে ইলেকট্রিক ফিল্ডের শক্তি পরিবর্তন করে বাষ্পকণা তৈরি করে, সেগুলোকে এক্স–রের মাধ্যমে চার্জিত করেন। এরপর কণাগুলোকে ভোল্টেজ প্রয়োগ করে অভিকর্ষের প্রভাবে নিচে নামিয়ে আনেন। অভিকর্ষণের টানে পতনশীল কণাগুলোর প্রান্তিক বেগ এবং তৈলকণা ও বাষ্পকণার পারস্পরিক বল হিসাব করে বাষ্পকণাগুলোর চার্জ হিসাব করেন। অভিকর্ষের কারণে নিচে পড়ার আগে পানির ফোঁটা মেঘের চারপাশে চার্জিত অণু তৈরি হয়। ইলেকট্রিক ফিল্ডের শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে তিনি এক ফোঁটাপানিকেও নিচে পড়ার ক্ষেত্রে ধীরে করতে পারতেন, এমনকি ধরে রাখতে পারতেন অভিকর্ষের বিপরীতে বিদ্যুতের মাধ্যমে। অণু থেকে পরমাণু আলাদা হয়ে এখানে ভাসে। মিলিক্যান এই পরীক্ষণের মাধ্যমে কণাগুলোর চার্জের পরিমাণ নির্ণয় করতে সক্ষম হন, যা ইলেকট্রনের চার্জের পূর্ণ সংখ্যার গুণিতক। মিলিক্যান ইলেকট্রনের যে পরিমাণ চার্জ হিসাব করেন।

৯. ইয়ংয়ের দ্বি-চির পরীক্ষা

ডাবল স্লিট দ্বি-চির পরীক্ষণ হলো পদার্থবিজ্ঞানের কালজয়ী একটি পরীক্ষা। আলো কণা না তরঙ্গ, এটা নিয়ে বিতর্ক ছিল। সেই বিতর্ক বন্ধের জন্য ব্রিটিশ বিজ্ঞানী টমাস ইয়ং ডাবল স্লিটের পরীক্ষাটা করেন। এই পরীক্ষা চালানো হয় ১৮০১ সালে। একটা দেয়ালে দুটি ছিদ্র করে একটা আলোকরশ্মি পাঠানো হয় সেই ছিদ্র দিয়ে। দুই ছিদ্রের ভেতর দিয়ে যাওয়া আলোকরশ্মি দেয়ালের ওপারে রাখা পর্দায় ব্যতিচার নকশা তৈরি করে। এ থেকেই ইয়ং সিদ্ধান্তে আসেন, আলো আসলে তরঙ্গ প্রকৃতির। তা না হলে ডাবল স্লিটের পরীক্ষায় আলো ব্যতিচার নকশা তৈরি করত না। আলো যদি কণা হতো, তাহলে আলো ওপারের পর্দায় দুটি গোল বিন্দু তৈরি করত।

ইয়ংয়ের পরীক্ষার আলোকে তরঙ্গ হিসেবে প্রমাণ করা হলেও প্রায় ১০০ বছর পর কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার সময় ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক আর আলবার্ট আইনস্টাইন দেখান, আলো আসলে একই সঙ্গে কণা তরঙ্গ। পরে ইলেকট্রনের মতো বস্তু কণাদের ওপরও ডাবল স্লিট পরীক্ষা চালানো হয়। তাতে দেখা যায়, আলোর মতো ইলেকট্রনও ব্যতিচার ধর্ম প্রদর্শন করে। ফলে প্রমাণিত হয়, বস্তু কণাদের প্রকৃতিও একই কণা ও তরঙ্গের মতো।

১০. রবার্ট পেইন ও পরিবেশ

১৯৬০ সালে পরিবেশবিজ্ঞানীরা একমত হন, প্রাণীদের আবাস মূলত উপাদানের বৈচিত্র্যের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়। এ বিষয়ে পর্যবেক্ষণের প্রচলিত পদ্ধতির বাইরে গিয়ে রবার্ট পেইন নতুন পথে এগোন। তিনি ভাবেন, পরিবেশে হস্তক্ষেপ করলে কী ঘটবে? তিনি ওয়াশিংটন স্টেটের সমুদ্র থেকে কিছু স্টারফিশ সরিয়ে একটি সুইমিংপুলে নিয়ে আসেন। একটি মুখ্য প্রজাতিকে সরিয়ে ফেলায় সমুদ্রের ওই অঞ্চলে সম্পূর্ণ ইকোসিস্টেম অস্থিতিশীল হয়ে যায়।

দেখা যায়, স্টারফিশ যে ঝিনুক শিকার করত, সেগুলো অস্থিতিশীল বা পাগল হয়ে গেছে। লিম্পেস্ট ও এলগাল প্রজাতি হারিয়ে গেল। পেইন দেখালেন, কোনো ইকোসিস্টেমে সব প্রজাতি সমান ভূমিকা রাখে না। একটি প্রজাতি হারিয়ে গেলে চেইন রিঅ্যাকশনের মতো অন্য প্রজাতি ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। পেইনের গবেষণা প্রজাতি সংরক্ষণ, একটি নির্দিষ্ট প্রজাতিকে সংরক্ষণ করার ধারণাকে বাতিল করে ইকোসিস্টেমকে টিকিয়ে রাখার ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করে। ২০১৬ সালে রবার্ট পেইন মারা যান। তাঁর কাজ ইকোলজি ও জলবায়ু পরিবর্তনে প্রজাতি সংরক্ষণে ভূমিকা রাখবে।